Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501057 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

Rabindra Sangeet Charcha and Sukumar Sen
রবীন্দ্রসংগীত চর্চা ও সুকুমার সেন

Chhotan Mondal
Researcher
Bengali Department
Kalyani University

Received on: 30th April 2026
Accepted on: 12th May 2026

Abstract:
Acharya Sukumar Sen harboured a deep personal fondness for Rabindra Sangeet. Of the five volumes comprising his magnum opus, 'Bangla Sahityer Itihas' (History of Bengali Literature), one entire volume is dedicated to Rabindranath Tagore, featuring a specific chapter devoted to his songs. Yet, this is merely the beginning; Acharya Sen authored numerous essays exploring the nuances of Rabindra Sangeet, most notably the celebrated collection titled 'Rabindranather Gaan' (The Songs of Rabindranath). These essays are now included in 'Sukumar Sener Prabandha Sankalan' (A Collection of Sukumar Sen's Essays), edited by his sons, Subhadrakumar Sen and Sunandankumar Sen. This discussion focuses on Acharya Sen's scholarly insight into Rabindra Sangeet and his fresh perspective on Rabindranath, as revealed through these writings.

Key Words:
Music, dance, art, culture, Rabindranath Tagore, Sukumar Sen

মূল প্রবন্ধ

আচার্য সুকুমার সেনের দীর্ঘ জীবনব্যাপী রবীন্দ্রচর্চা নানাভাবে অব্যাহত ছিল। রবীন্দ্রজীবনচর্যায়, রবীন্দ্রসাহিত্যে যেমন তাঁর অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল অন্যদিকে রবীন্দ্রসংগীত সাধনায় নিজেকে আজীবন নিমগ্ন রেখেছেন। সুকুমার সেন তাঁর আত্মজীবনী 'দিনের পরে দিন যে গেল' গ্রন্থে বলেছেন — "ভিড়ের মধ্যে ধোঁয়া-ধাক্কা যে পাইনি তা নয়। জীবনে আরও নানারকম ভয়-ভাবনার মধ্যে দিয়ে দিন কাটছে। আমি রবীন্দ্রনাথের একলব্য চেলা বলে অহঙ্কার করি। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি পাব কোথায়? তবে তাঁর বাণীর ভরসা রাখি।"[১] সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের অন্তর্গত রবীন্দ্রখণ্ডে পঞ্চম সংস্করণ অনুযায়ী শেষ তথা একবিংশ পরিচ্ছেদ "সুরের সুরধ্বনি, মধুমিশ্রা'য় সুকুমার সেনের রবীন্দ্রসংগীত চিন্তার বীজ রোপিত হয়েছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে সুকুমার সেন সেখানে রবীন্দ্রনাথের গান রচনার ইতিহাস, শ্রেণিবিভাগ ও আঙ্গিক বিশ্লেষণ করেছেন। আচার্য সুকুমার সেন বলেছেন — "রবীন্দ্রনাথের গান রচনার ইতিহাসে চার অধ্যায়।"[২] এই চার অধ্যায় হলো যথাক্রমে —

প্রথম অধ্যায় — পরীক্ষা। এই অধ্যায়ে সুকুমার সেন রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রথম গান রচনার সূত্রপাত, পরিবার-পরিজন ও পরিবেশের কথা তুলে ধরেছেন। এই স্তরে বৈষ্ণব পদাবলির ভাষায় ও ফর্মে 'ভানুসিংহ-ঠাকুরের পদাবলী'র কবিতা-গানগুলির কথা আছে।

 © Santiniketan Sahityapath

দ্বিতীয় অধ্যায় — কালপর্ব ১২৯১ ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’ থেকে ১৩০৭ ‘কল্পনা’ পর্যন্ত। এই সময়পর্বে সুকুমার সেন রবীন্দ্রনাথের সুরসৃষ্টিতে পল্লীসংগীত ও কীর্তনগানের প্রভাবের কথা বলেছেন। রবীন্দ্র-সংগীতে কীর্তনগানের বিভিন্ন রীতির মধ্যে মধু-কানের প্রভাব কতটা ছিল তার প্রমাণ সুকুমার সেন দিয়েছেন এই গান দু’টিতে — প্রকৃতির-প্রতিশোধের “মরি লো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে?” এবং মায়ার-খেলার “ওকে বলো সখি বলো, কেন মিছে করে ছল।” এই পর্বের গানে লোকসংগীতের প্রভাবও লক্ষ করেছেন সুকুমার সেন। লোকসংগীতের সুর আশ্রয় করে হৃদয় বেদনার প্রকাশে ‘কড়ি ও কমল’এর “আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে কি জানি পরাণ কি যে চায়” গানটি এবং ‘বৈঠুকি’ গানের মধ্যে নিধুবাবু, শ্রীধর, কথক প্রভৃতির টপ্পা রীতিতে রবীন্দ্রনাথের “মনে রয়ে গেল মনের কথা” — গানের উল্লেখ করেছেন সুকুমার সেন। রবীন্দ্র-সংগীতের বাউল গানের ভাব ও ভঙ্গিতে “যমের দুয়ার খোলা পেয়ে”; “আমারে কে নিবি ভাই”; “যার অদৃষ্টে যেমন জুটেছে”; “ক্ষ্যাপা তুই আছিস আপন খেয়াল ধরে” ইত্যাদি গানের উল্লেখ করেছেন সুকুমার সেন।

তৃতীয় অধ্যায় — শান্তিনিকেতন পর্ব। এ সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিচিত্তে বাউল গানের যে বীজ রোপিত হয়েছিল, তা অঙ্কুরিত হয়ে ডালপালা বিস্তার করতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের অসামান্য সৃষ্টি ‘গীতাঞ্জলি’, ‘গীতিমাল্য’ ও ‘গীতালি’র গানে ভেসেছেন সুকুমার সেন।

চতুর্থ তথা শেষ অধ্যায় — প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান থেকে এই অধ্যায়ের সূচনা হিসেবে দেখিয়েছেন সুকুমার সেন। রবীন্দ্রসংগীতের ইতিহাসে এই সময় ভাব-সুর-লয়ের সঙ্গে নাচের যে ‘জ্যামিতিক প্যাটার্ন’ দেখা গিয়েছিল সুকুমার সেন তার উদাহরণ হিসেবে “এ শুধু অলস মায়া” গানের কথা তুলে ধরেছেন।

রবীন্দ্রসংগীতের-ভাবনায় আচার্য সুকুমার সেনের উল্লেখযোগ্য রচনা — ‘রবীন্দ্রনাথের গান’ নামে নামে দুটি বিখ্যাত প্রবন্ধ। ‘রবীন্দ্রনাথের গান (১)’: এটি ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে ‘নীলাঞ্জনা’য় প্রকাশিত। সুকুমার সেন এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে গানকে সর্বাধিক দীর্ঘস্থায়ী বলে উল্লেখ করেছেন। সুকুমার সেনের কাছে — “গানের আবেদন কবিতা, গল্প, উপন্যাস এবং ছবির মতো চোখের মধ্যে দিয়ে বোধের উন্মেষে নয় সবটা নয়, অনেকটাই কানের ভিতর দিয়ে মর্মে স্পন্দন তোলায়।”[৩] রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মের মধ্যে গান অর্থাৎ সুরের আবেদন বুদ্ধিতে নয়, অনুভবে। কবিতা ও গানের আবেদনে সুকুমার সেনের মন্তব্য — “কথার মানে ধরতে গেলে দুটিই খুব দুরূহ, কিন্তু গানটি শুনলে মন ভরে ওঠে, মনে হয় বুঝেছি।”[৪] রবীন্দ্র-সংগীতের বিশ্লেষণে সুকুমার সেন পাঁচটি শ্রেণিভেদ দেখিয়েছেন। যথা —

প্রথম — ফরমাসি গান
দ্বিতীয় — ফরমাসি নয় গতানুগতিক গান
তৃতীয় — উদ্দেশ্যমূলক ও আনুষ্ঠানিক গান
চতুর্থ — মনের আবেগে উৎসারিত এবং
পঞ্চম — মর্মের ব্যাকুলতায় গুঞ্জরিত।

সুকুমার সেনের মতে, প্রথম শ্রেণির গানগুলি বেশিরভাগই “ব্রহ্মসঙ্গীত”। দ্বিতীয় ও পঞ্চম শ্রেণির গানগুলির পরিবেশনার ক্ষেত্রে সুকুমার সেন তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁর বক্তব্য, দ্বিতীয় ও পঞ্চম শ্রেণির গানগুলির ‘পরিবেশনা’ যদি সংযত করা না হয়, ‘হাল্কা কথার এই ক’খানা গান ভারি কাজের ভরাডুবির আগেই তলিয়ে যাবে।’

‘রবীন্দ্রনাথের গান (২)’: এটি ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ স্মারক বক্তৃতা। প্রথমে গানের স্বরূপ বিশ্লেষণে সুকুমার সেন ‘ভাষাবৃক্ষ ও তার দুটি পাতা’র রূপক ব্যবহার করেছেন। এই পাতা দুটি হলো — কবিতা ও গান। উভয়ের উৎস এক হলেও তাদের বিকাশ, প্রকাশভঙ্গি আলাদা আলাদা সব। সুকুমার সেনের ব্যাখ্যায় কবিতা ও গান যথাক্রমে ‘পশু’ ও ‘পাখি’। আর গানের দু’টি পাখা হলো সুর ও তাল। কবিতা ও গানের বিশ্লেষণে ‘ডাইমেনসন’ তত্ত্বসূত্র ধরে সুকুমার সেন বলেছেন, ‘কবিতার জগৎ তিন ডাইমেনসনের — বাক্, অর্থ ও ছন্দ’। আর ‘গানের জগৎ চতুরায়তন অর্থাৎ চার ডায়মেনসনের — বাক্, অর্থ, তাল (ছন্দ) ও

সুরের'। সুকুমার সেনের মতে, "রবীন্দ্রনাথই একমাত্র কবি যিনি পৃথিবীর সাহিত্যে চার ডাইমেন্সনের গানের জগৎ খুলে দিয়ে গেছেন।"[৫] এই 'ফোর ডাইমেন্সন' তত্ত্বের নিরিখে সুকুমার সেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের তরীতে ভেসেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম দিকের পাঁচটি কাব্য — 'শৈশব সঙ্গীত', 'সন্ধ্যাসঙ্গীত', 'প্রভাত সঙ্গীত,' 'ছবি ও গান' এবং 'কড়ি ও কোমল' নামের সঙ্গে 'সঙ্গীত' শব্দের উল্লেখ প্রসঙ্গে সুকুমার সেনের মন্তব্য — "তা হল আসলে কবি-ভাবনার অস্ফুট প্রকাশনের ব্যাকুলতা-চঞ্চলতা।"[৬]

রবীন্দ্রনাথের 'চতুরায়তন' বা 'চতুরঙ্গ' (four dimensional) গানের প্রথম ও নিখুঁত নিদর্শন হিসেবে সুকুমার সেন ১২৯৯ বঙ্গাব্দে 'সাধনা'য় প্রকাশিত "শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা" গানটির উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের "চতুরঙ্গ" গানে আত্মভাবনা — "স্বপন-পারের ডাক শুনেছি, জেগে তাই তো ভাবি —"; ছবি — "ভাঙা তরী ধরে ভাসে পারাবারে"; আবার নৈরাশ্য ভাবনায় — "আমার নাইবা হল পারে যাওয়া"; বাউল সুরে আবিষ্ট — "আমার সেইখানেতে কল্পলতা যেখানে মোর দাবি-দাওয়া"; রবীন্দ্রনাথের মানবাত্মার চরম মুক্তির ভাবনায় — "গানের সুরে আমার মুক্তি ঊর্ধ্বে ভাসে" ইত্যাদি বৈচিত্র্যের কথা তুলে ধরেছেন সুকুমার সেন। ফোর ডাইমেন্সনের তত্ত্বসূত্র ধরে সুকুমার সেন রবীন্দ্রনাথের রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার সিম্বল 'বঁধু'; কবিসত্তার বেহাগ রাগিণীতে 'বাঁশি'র "আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি" গানের উল্লেখ করেছেন। সুকুমার সেনের দৃষ্টিতে 'বীণা' সিম্বল সবচেয়ে আকর্ষণীয়ভাবে উপেক্ষিত সেটি হলো, "লহো লহো তুলে লোহ নীরব বীণাখানি" গানটি। দোহারকি ধুয়ার প্রয়োগে "ওহে সুন্দর হে সুন্দর"; traditional রামায়ণ গান পাঁচালি ধুয়াঠাটে "তোমার চেয়ে আছি বসে পথের ধারে সুন্দর হে"; জড় থেকে জীবের বিবর্তনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা ইতিহাস "চতুরঙ্গ" গানের মোড়কে পরিবেশিত "তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ"; পুরাণ জ্ঞান ও পুরাণ বোধের পরিচয়ে "দুঃখ বলে 'রইনু চুপে তাহার পায়ের চিহ্নরূপে" গান; নব কীর্তনের ঠাটে "আমার মনের মাঝে যে গান বাজে শুনতে কি পাও গো"; "আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে, চাও কি —"; রবীন্দ্রনাথের "চতুরঙ্গ" গানে 'রূপকথার মোটিফে' "এ দিন আজি কোন্ ঘরে গো খুলে দিল দ্বার"; "এবার দুঃখে আমার অসীম পাথার পার হল যে, পার হল" প্রভৃতি গানের উল্লেখে সুকুমার সেনকে গানের বিচিত্র ধারায় নবরূপে আবিষ্কার করা যায়।

'অধরা মাধুরী'র খোঁজে সুকুমার সেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছন্দ, ভাষা, ভাব ও কীর্তন-ভাঙা অদ্ভুত সুন্দর সুরের "অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দোবন্ধনে" গানের দশ মাস পরে লেখা 'সানাই'এর 'অধরা' কবিতা "অধরা মাধুরী ধরা পড়িয়াছে /এ মোর ছন্দবন্ধনে।" রচনা দুটির মর্মবস্তু এক হলেও "ডায়মেন্সন" তত্ত্বসূত্রের নিরিখে আচার্য সেনের বক্তব্য — "কবিতাটি ছবি, চোখের কানের ও মনের ভোগ — তিন ডায়মেনসনের রসবস্তু। গানে তার উপর আছে অন্তরের বেদনা যা সুরের রসে দিক হারিয়ে গেছে চতুর্থ ডাইমেনসনে।"[৭]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মান্তরে বিশ্বাসী ছিলেন না, "আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে/ আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে" গানই তার চরম প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথের কাছে মানুষ প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। 'প্রাণ নিসর্গের সঙ্গে বৃহৎ প্রাণের সঙ্গে একতালে স্পন্দিত।' রবীন্দ্রনাথের বহু গানে তাঁর অধ্যাত্ম-ভাবনার পরিচয় আছে। আচার্য সুকুমার সেন তাঁর 'স্মরণ-মঙ্গল' শীর্ষক নিবন্ধে তার বহু দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। আবার 'রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণব সাধনা' শীর্ষক প্রবন্ধে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব সাধনার এবং রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চেতনার মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের প্রেক্ষিতে তাঁদের ভাবজগতের অন্তর্নিহিত এক গভীর ঐক্যের অনুসন্ধান করেছেন।

চৈতন্যদেবের অধ্যাত্মভাবনা ও ধর্মচিন্তার সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় আটটি সংস্কৃত শ্লোকে গ্রথিত তাঁর 'শিক্ষাষ্টক' মহাগ্রন্থে। অন্যদিকে, রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মভাবনা ও ধর্মসাধনার পরিচয় ছড়িয়ে আছে তাঁর অজস্র কবিতায় ও গানে। চৈতন্যদেবের 'শিক্ষাষ্টক'এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গানগুলির মধ্যে সাদৃশ্য অনুধাবন করে দুজনের ভাবগত ঐক্যের দিকটিকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন ড. সুকুমার সেন। নমুনা —

চৈতন্যদেবের 'শিক্ষাষ্টক'-এর প্রথম শ্লোক : আধ্যাত্মিকতার বা ভগবৎশরণের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তার কথা বিবৃত —

"চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরব-চন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।

© Santiniketan Sahityapath

আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদন
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্।।"[১]

~ রবীন্দ্রনাথের গান: 'গীতিমাল্য' এর ১৩ সংখ্যক রচনা —

"এই যে এরা আঙিনাতে
এসেছে জুটি।
মাঠের গোরু গোঠে এনে
পেয়েছে ছুটি। ঘরের ছেলে ঘরের মেয়ে
বসেছে মিলে।
তারি মাঝে তোমার আসন
তুমি যে নিলে।"

দ্বিতীয় শ্লোক: ভগবানের নামের বিপুল বৈচিত্র্য ও পরম মহিমার কথা উল্লিখিত —

"নাম্নামকারি বহুতা নিজসর্ব্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি,
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।।"[২]

~ রবীন্দ্রনাথের গান: এই শ্লোকের সঙ্গে আচার্য সেন রবীন্দ্রনাথের যে তিনটি গানের তুলনা টেনেছেন —

(i) "আমার মুখের কথা তোমার
নাম দিয়ে দাও ধুয়ে
আমার নীরবতায় তোমার
নামটি রাখো থুয়ে।
রক্তধারায় ছন্দে আমার
দেহবীণার তার
বাজাক আনন্দে তোমার
নামেরি ঝংকার।" (গীতিমাল্য)

(ii) "ফিরে ফিরে ডাক্ দেখি রে পরাণ খুলি
ডাক্ ডাক্ ফিরে ফিরে।
দেখব কেমন রয়সে ভুলে।
সাঁজ সকালে রাত্রিবেলায়
ক্ষণে ক্ষণে
এক্‌লা বসে ডাক্ দেখিতায়
মনে মনে।
নয়ন তোরই ডাকুক তারে,
শ্রবণ রহুক পথের ধারে,
থাক্ না ডাক্ গলায় গাঁথা।
মালার ফুলে।"

© Santiniketan Sahityapath

(iii)

"আকাশ জুড়ে শুনিনু ওই বাজে
'তোমারি নাম সকল তারার মাঝে' ।।
সে নামখানি নেমে এল ভূঁয়ে,
কখন আমার ললাট দিল ছুঁয়ে।
শান্তি ধারায় বেদন গেল ধুয়ে—
আপন আমার আপনি
মরে লাজে॥
অমনি করে আমার এ হৃদয়
তোমার নামে হোক না
নামময়।"

তৃতীয় শ্লোক ও চতুর্থ শ্লোক: ভগবানের নাম সাধনায় গভীর নিষ্ঠা ও দৃঢ় সংযমের কথা প্রকাশিত —

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ।।"[৩]

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে,
ভবতাঙক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।।"[৪]

~ রবীন্দ্রনাথের গান: এই শ্লোকের সমর্থনে আচার্য সেন গীতাঞ্জলি থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে গানটির উল্লেখ করেছেন—

"ওই আসন তলে মাটির পরে লুটিয়ে রব,
তোমার চরণ ধুলায় ধুলায় ধূসর হব।
কেন আমায় মান দিয়ে আর
দূরে রাখ?
চিরজনম এমন করে ভুলিয়ো নাকো।
অসম্মানে আনে টেনে পায়ে তব।
তোমার চরণ ধুলায় ধুলায়
ধূসর হব।"

পঞ্চম শ্লোক: প্রেমের গাঢ়তা জড়িত বিরহ বেদনার ও দৈন্যের প্রকাশ —

"অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং, পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়।।"[৫]

~ রবীন্দ্রনাথের গান: এই শ্লোকের ভাব সমর্থনে আচার্য সেন রবীন্দ্রনাথের যে গানটির তুলনা করেছেন —

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ ধুলার তলে।
সকল অহংকার হে
ডুবাও চোখের জলে।"

ষষ্ঠ শ্লোক: ভক্তি গাঢ় হলে চিত্তে আনন্দস্ফূর্তি ও ভাব তন্ময়তার কথা বিবৃত —

"নয়নং গলদশ্রুধারয়া, বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা।

© Santiniketan Sahityapath

পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা, তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি।।"[৬]

~ রবীন্দ্রনাথের গান: এই শ্লোকটির সঙ্গে ড. সেন রবীন্দ্রনাথের গীতিমাল্যে সংকলিত গানটির উল্লেখ করেছেন —

"কেন চোখের জলে ভিজিয়ে
দিলেম না শুকনো ধুলো যত।
কে জানিত আসবে তুমি গো
অনাহূতের মতো।"

সপ্তম শ্লোক: ভক্তি থেকে প্রেম এবং প্রেমের বেদনার কথা প্রকটিত —

"যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেন মে।।"[৭]

~ রবীন্দ্রনাথের গান: এই শ্লোকের সমর্থনে তুলনা করা হয়েছে —

"আমার নিখিলভুবন হারালেম আমি যে।
বিশ্ববীণায় রাগিণী যায় থামি যে।
গৃহহারা হৃদয় হায় আলোহারা পথে ধায়,
গহন তিমির গুহাতলে যাই নামি যে।"

শেষ তথা অষ্টম শ্লোক: সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ তথা ভগবৎ প্রেমের ব্যাকুল ঐকান্তিকতা গুঞ্জরিত —

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো,
মৎপ্রানাথস্তু স এব নাপরঃ।।"[৮]

~ রবীন্দ্রনাথের গান: এ শ্লোকের ভাব সমর্থনে উল্লেখ্য —

"না রে না রে ভয় করব না বিদায়বেদনারে।
আপন সুধা দিয়ে ভরে দেব তারে।
চোখের জলে সে যে নবীন রবে
ধ্যানের মণিমালায় গাঁথা হবে
পরব বুকের হারে।
নয়ন হতে তুমি আসবে প্রাণে, মিলবে
তোমার বাণী আমার গানে গানে।
বিরহ ব্যথায় বিধুর দিনে দুখের আলোয়
তোমায় নেব চিনে
এ মোর সাধনা রে।"

মোটকথা, রবীন্দ্রনাথের গীতিশিল্প একটু গভীরে গিয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব সাধনা এবং রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চেতনা মূলত একই সূত্রে গাথা। ড. সেনের কথায় — "চৈতন্যদেব দেবতাকে প্রিয় করেছিলেন আর রবীন্দ্রনাথ প্রিয়কে দেবতা করেছিলেন। কিন্তু ভিতর থেকে দেখলে কোন তফাত নেই।"[৮]

১৩৭৭ বঙ্গাব্দে 'অমৃত সাপ্তাহিক' পত্রিকায় প্রকাশিত আচার্য সুকুমার সেন 'রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে কবিতা-গান' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় ও গানে রূপকধর্মিতা বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী'র 'পরশ-পাথর'

এবং আচার্য সেনের তথ্য অনুযায়ী তার ঠিক আগের দিনে লেখা 'হিং টিং ছট্', 'রবীন্দ্রনাথের নিপুণ হস্তের প্রথম রূপক কবিতা রচনা'। ব্রহ্ম ও বেদান্তের পাশাপাশি জীবনের মূল্যের রস অন্বেষণে রূপকের বীজ নিহিত — 'ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর...' মানুষের জীবনের উঠতি বয়স ও পড়তি বয়স এই সময়ই বিভাগ অনুসারে নতুন-পুরাতনের অনুভব এবং অপূর্ণতার ব্যক্তিগত ট্র্যাজিক তত্ত্ব ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই অমরত্ব ভাবনায় ইহজীবন গুরুত্ব পেয়েছে — 'মরার পরে চাইনে ওরে অমর হতে।'

অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের গানে ছবি ও রূপকের ব্যবহার এবং তত্ত্বের অন্বেষণে রত হয়েছেন সুকুমার সেন। এ প্রসঙ্গে 'ঐ রে তরী দিল খুলে। তোর বোঝা কে নেবে তুলে'; 'মাটির প্রদীপখানি আছে/ মাটির ঘরের কোলে'; 'অমর শিখা আকুল হল/ মর্তশিখায় উঠতে জ্বলে'; 'এ দিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিলে দ্বার' ইত্যাদি গানের কথা উল্লেখিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অধ্যাত্মভাবনার মিল বা ঐক্য অনুসন্ধানের পাশাপাশি আচার্য সুকুমার সেন রবীন্দ্রশিল্প বৈষ্ণব ভাবনার দ্বারা কতটা প্রভাবিত ও আচ্ছাদিত ছিল তার পরিচয় দিয়েছেন 'রবীন্দ্রশিল্পে প্রেমচৈতন্য ও বৈষ্ণব ভাবনা' শীর্ষক প্রবন্ধে। সেখানে রবীন্দ্রশিল্প বলতে বিশেষত রবীন্দ্রগীতি শিল্পকে ধরে আলোকপাত করা হয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলি ও প্রেমতত্ত্ব অনুসারে এটি মোট ছ'টি বিভাগে বিন্যস্ত। পদাবলি কীর্তন শুরুর আগে যেমন একটি গৌরচন্দ্রিকা বা মুখবন্ধ করা হয়, তেমনি আচার্য সেন প্রবন্ধের প্রধান বিষয়ে প্রবেশের পূর্বে 'গৌরচন্দ্রিকা' নামক বিভাগে লেখক তাঁর আলোচনার বিষয়, উদ্দেশ্য, তাত্ত্বিক ভিত্তি, পদ্ধতি ও কাঠামো স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তাঁর আলোচনার পরবর্তী প্রধান তিনটি বিভাগ হলো —

পূর্ব-রাগ: স্নেহ-প্রেমসঞ্চারের পূর্বাবস্থা
অনু-রাগ: স্নেহ-প্রেমসঞ্চারের প্রথম অবস্থা এবং
বি-রহ: প্রেমে নিমগ্ন অবস্থা

এছাড়া পদাবলি কীর্তনের প্রভাবযুক্ত একটি বিভাগ আছে। নাম — পদাবলির ঠাট। যেখানে পদাবলি রচনার গাঁথুনি ও গাইবার ভাব রবীন্দ্রনাথের গীতশিল্পে কীভাবে অনুরঞ্জিত হয়েছে তা দেখানো হয়েছে।

'পূর্ব-রাগ' পর্বে রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও চেতনায় বৈষ্ণব ভাবনার প্রথম বীজ কীভাবে রোপিত হয়েছিল, তার বিশ্লেষণ আছে। বৈষ্ণবসাহিত্যে নায়ক-নায়িকার মিলনের পূর্বে দর্শন ও শ্রবণাদিজনিত যে রতি ভাবের উৎস হয়, তাকে পূর্বরাগ বলা হয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রথমদিকে রামমোহন রায় থেকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বৈষ্ণব-ঐতিহ্য স্মৃতি পরিবার ও পরিজন বিশেষভাবে জ্যোতিরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীকণ্ঠ সিংহ, জ্যোতিঃপ্রকাশ গাঙ্গুলি, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, কিশোরী চাটুয্যের গীতরসের দীক্ষা, কালিদাসের 'গীতগোবিন্দ', বিদ্যাপতির পদাবলির প্রভাব, সর্বোপরি কাদম্বরী দেবীর প্রেম-প্রীতি এবং মৃত্যু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনে অধ্যাত্মদৃষ্টি সৃষ্টির উৎসার।

'অনু-রাগ' নামক পর্বে রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রেমচেতনা পূর্বরাগ থেকে কীভাবে উৎসারিত হয়ে তা গভীরে প্রবেশ করেছে, তীব্র মিলন-আকাঙ্ক্ষা ও বেদনামিশ্র প্রেমে রূপলাভ করেছে। ১২৯০ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহ, ১২৯১ এ বধূঠাকুরাণী কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যা বাহ্যত তিনি ঠিক থাকলেও অন্তরে সেই শোক দীর্ঘকাল ক্রিয়াশীল ছিল। ধীরে ধীরে কাব্য ও গানে তা প্রতিফলিত হয়েছে। আচার্য সেন রবীন্দ্র রচনায় বিশেষত গানে কীভাবে তা প্রতিফলিত হয়েছে উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন, 'কাছে থেকে দূর রচিত কেন গো আঁধারে।/ মিলনের মাঝে বিরহকারায় বাঁধা রে'; 'সে দিন আমায় বলেছিলে আমার সময় হয় নাই/ ফিরে ফিরে চলে গেলে তাই'...; 'আমার ভাঙা পথের রাঙা ধূলায় পড়েছে কার পায়ের চিহ্ন'; প্রেমের স্মৃতিপূর্ণ ছবি 'সুখে আছি, সুখে আছি সখা, আপনমনে।/ কিছু চেয়ো না, দূরে যেয়ো না,/ শুধু চেয়ে দেখো, শুধু ঘিরে থাকো কাছাকাছি'; 'না চাহিলে যারে পাওয়া যায়', 'মরি লো মরি'; 'ওগো শোনো কে বাজায়'; মানবজীবন সম্বন্ধে সত্য এবং রোমান্টিক এস্টিমেট ভাবনায় 'শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাষা।/ শুধু আলো-আঁধারে কাঁদা হাসা'; 'আজকে এমন দিনে শুধু পড়ে মনে/ সেই দিবা-অভিসার পাগলিনী রাধিকার/ না জানে সে কবেকার দূর বৃন্দাবনে!'; 'আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তাই কেমনে?/ কেন নয়নের জল ঝরিছে বিফল নয়ন?' ইত্যাদি গানের উল্লেখ করেছেন সুকুমার সেন। বৈষ্ণব পদাবলির বিরহিণী ভাবনা সেইসঙ্গে মেঘদূতের বিরহী ভাবনা সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়েছে 'যত শুনি সেই

© Santiniketan Sahityapath

অতীত কাহিনী' গানে। আর বিরহী ভাবনার সঙ্গো অভিসারের ছবি ধরা পড়েছে — 'তোমার আমার মিলন হবে বলে... ' গানে। তবে এই অভিসার বিরহী এবং বিরহিণীর দু'তরফেই। স্বয়ম্বর অভিসার-ভাবে 'মেঘ বলেছে যাব যাব, রাত বলেছে যাই'; বিরহবেদনার আনন্দময় পরিণতির ছবিতে আঁকা 'কূল থেকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে' ইত্যাদি গানের উল্লেখ করেছেন। আচার্য সুকুমার সেন রবীন্দ্ররচনায় বিরহ-বেদনার প্রকাশ ও পরিণতিকে পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করেছেন। যথাক্রমে —

১. নির্বেদ — 'সে যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগি নি/ কী ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী।'
২. ক্ষতিবোধ — 'অনেকদিন পরাণহীন ধরণী।' ('মানসী'র 'নতুন প্রেম' কবিতা)
৩. ক্ষতিপূরণ — 'অন্তরে জাগিছে অন্তর্যামী।... '
৪. সান্নিধ্য — 'তুমি বাহির থেকে দিলে বিসম তাড়া।... '
৫. আনন্দ — 'ভরা থাক স্মৃতিসুধায় বিদায়ের পাত্রখানি।... ' ইত্যাদি।

'বিরহ' পর্বে প্রাবন্ধিক সুকুমার সেন দেখাতে চেয়েছেন কীভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রেম শেষ পর্যন্ত বিরহ, বেদনাবোধ ও আধ্যাত্মিক আত্মসমর্পণে পরিণত হয়েছে। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ বলতে আমরা বুঝি, প্রিয়ের অনুপস্থিতি বা বিচ্ছেদ। তবে এই বিচ্ছেদই প্রেমকে সর্বোচ্চ তীব্রতায় নিয়ে যায়। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের জীবনের আর্থিক সংকট ও মানসিক চাপ তাঁর অন্তর্মুখী অধ্যাত্মভাবনা বহির্মুখী হয়ে যায়। অতীত বা ভবিষ্যৎ নয়, ওমর খয়্যামের মত বর্তমানবাদ প্রকট হয়ে ওঠে — 'মনেরে আজ কহো যে,/ ভালো মন্দ যাহাই আসুক/ সত্যেরে লও সহজে...'; 'আমি ছেড়েই দিতে রাজি আছি' ইত্যাদি। 'ক্ষণিকা', 'নৈবেদ্য', 'খেয়া', 'শিশু', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি'র কবিতা ও গানে মিলিতভাবে প্রেম ভক্তিরূপে পরিণত হয়ে তাহলে উঠেছে আত্মশুদ্ধির সাধনা।

বৈষ্ণব পদাবলি রচনার গাঁথুনি ও গাইবার ভাবানুরূপ পারম্পর্য অনুযায়ী আচার্য সুকুমার সেন তাঁর এ-আলোচনার শেষ বিভাগটির নাম রেখেছেন — 'পদাবলীর ঠাট'। রবীন্দ্রনাথের গীতিশিল্পে পদাবলী কীর্তন গানের ঠাটের প্রভাব কীভাবে অনুরঞ্জিত হয়েছে তা আচার্য সেন কয়েকটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করে আলোকপাত করেছেন। যথাক্রমে —

(ক) পূর্বরাগ-অনুরাগ: এই পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতিমাল্য' থেকে 'এমনি করে ঘুরিবো দূরে বাহিরে'; অনুরাগ পর্যায়ের 'ওগো শোনো কে বাজায়'; মরি লো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে'; 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে'; 'গানের সুরের আসনখানি পাতি পথের ধারে' ইত্যাদি।

(খ) লজ্জা-সঙ্কোচ-ভীরুতা: এখানে বৈষ্ণব পদাবলির মতো শুধু রাধার দিক থেকে নয়, রবীন্দ্রনাথের কবিতা-গানে এই ভাব দেখা গেছে দুদিক থেকেই। তার উদাহরণ ড. সেন উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন — নায়িকার তরফে, 'সে আসে ধীরে,/ যায় লাজে ফিরে... '; নায়কের তরফে, 'যদি বারণ কর তবে গাইব না/ যদি শরম লাগে মুখে চাহিব না... '। রবীন্দ্রগীতি শিল্পে লজ্জা-সঙ্কোচ-ভীরুতার মধ্যে অন্যমনস্কতাও লক্ষণীয় — 'একলা বসে একে একে অন্যমনে/ পদ্মের দল ভাসাও জলে অকারণে।... '; এই পর্যায়ের অন্তর্গত 'মান' এবং 'মানভঞ্জন' বিষয়ক গানেরও উদাহরণ দেখিয়েছেন সুকুমার সেন — 'বনে এমন ফুল ফুটেছে/ মান করে থাকা আজ কি সাজে/ মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে/ চলো চলো কুঞ্জমাঝে।।' ইত্যাদি।

(গ) 'ক্ষণ-মিলন' অর্থাৎ মুহূর্ত এবং উৎসব। এই প্রসঙ্গো রবীন্দ্রগানের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত — 'দুজনে দেখা হল মধুযামিনী রে —'; 'বিরহ মধুর হল আজি মধুরাতে'; 'সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে, ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা।/ সেই স্মৃতিটুকু কভু খনে খনে যেন জাগে মনে ভুলো না'; 'আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে'; 'ওগো কিশোর, আজি তোমার দ্বারে পরান মম জাগে'; 'বঁধু, তোমায় করব রাজা তরুতলে'; তুমি বাহির থেকে দিলে বিষম তাড়া' ইত্যাদি।

(ঘ) অভিসার — এটি বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যে একটি অন্যতম পর্যায়। সেখানে অভিসার ঘটেছে একতরফা। অভিসারী নায়িকা রাধা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানে পার্থক্য দেখা যায়। ড. সুকুমার সেন বলেছেন — "রবীন্দ্রনাথের গানে কিন্তু অভিসার দো-তরফা, অনুরাগিনী চলেছেন অভীষ্টের সন্ধানে এবং অনুরাগী চলেছেন ঈপ্সিতার সঙ্গো মিলিত হতে। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের গানে "উভয়াভিসার"ও আছে। "উভয়াভিসারে" অনুরাগিণী এবং অনুরাগী দুজনেই পরস্পরের সঙ্গো মিলিত হওয়ার জন্যে অভিসারে

© Santiniketan Sahityapath

চলেছেন। অভিসার বিষয়ে পদাবলির সঙ্গো রবীন্দ্রনাথের গানের আরো একটা বড়ো তফাৎ দেখা যায়। পদাবলিতে অভিসার প্রকাশ্যে নয়, সর্বদা গোপনে। রবীন্দ্রনাথের গানে প্রায় সর্বদাই প্রকাশ্যে, দৈবাৎ গোপনে।"[৯] অভিসারের এই বিচিত্ররূপের দৃষ্টান্ত আচার্য সেন উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন — অনুরাগীর অভিসার, 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার/ পরাণ সখা বন্ধু হে আমার।।'; অনুরাগিণীর অভিসার, 'কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারই ঘায়ে —'; উভয়াভিসার, 'কূল থেকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে সাগরমাঝে'; 'মেঘ বলেছে যাব যাব রাত বলেছে যাই'; 'তোমায় আমায় মিলন হবে বলে আলোয় আকাশ ভরা'; গোপন অভিসারের ছবি 'আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে' ইত্যাদি।

(ঙ) বাসকশয্যা (ও প্রতীক্ষা) — মিলনের আশায় অনুরাগিনীর প্রস্তুতির বর্ণনা। এ বিষয়ে প্রাবন্ধিক সুকুমার সেন রবীন্দ্রনাথের যেসব গানের উল্লেখ করেছেন, সেগুলি হলো — "ওহে সুন্দর মম গৃহে আজি পরমোৎসব-রাতি,/ রেখেছি কনক মন্দিরে কমলাসন পাতি'; 'তোমায় চেয়ে আছি বসে পথের ধারে সুন্দর হে'; 'আজি এ নিরালা কুঞ্জে আমার অঙ্গ-মাঝে...' ইত্যাদি।

(চ) বিরহ-ভাবনায় অথবা বিরহে প্রেমবৈচিত্ত্য — রবীন্দ্রনাথের বিরহ-ভাবনায় গানের উদাহরণ হিসেবে সুকুমার সেন — 'লিখন তোমার ধুলায় হয়েছে ধুলি'; 'দিনের পরে যায় দিন বসি পথ পাশে'; 'দিনের পরে দিন যে গেল আঁধার ঘরে'; প্রেমবৈচিত্ত্য গানের দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'তিমির অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি', 'দীপ নিবে গেছে মম নিশীথসমীরে/ ধীরে ধীরে এসে তুমি যেয়ো না গো ফিরে', 'আমায় জ্বলে নি আলো অন্ধকারে/ দাও না ছাড়া কি তাই বারে বারে' ইত্যাদি গানের উল্লেখ করেছেন।

(ছ) বিরহে দৌত্য — বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যে কৃষ্ণ ব্রজধাম পরিত্যাগ করলে দীর্ঘ বিরহে অবসন্ন রাধার প্রাণ রক্ষার জন্য সখী তাঁর দূতী হয়ে কৃষ্ণের খোঁজে মথুরায় গেলে কৃষ্ণ দূতিকে চিনতে না পেরে বিদেশিনী বলে মনে করেছিল। রবীন্দ্রনাথের গানে এই দূতী তাঁর কবিসত্তাই এবং তা কখনো কখনো জীবনদেবতার দৃষ্টিতে হঠাৎ বিদেশিনী বলে মনে হয়েছিল। আচার্য সেন তার কিছু উদাহরণ উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন — "দূরের বন্ধু সুরের দূতীরে পাঠালো তোমার ঘরে।/ মিলনবীণা যে হৃদয়ের মাঝে বাজে তব অগোচরে"; "আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী।/ তুমি থাক সিন্ধুপারে ওগো বিদেশিনী"; "উদাসিনী-বেশে বিদেশিনী কে সে নাইবা তাহারে জানি/ রঙে রঙে লিখা আঁখি মরীচিকা মনে মনে ছবিখানি" ইত্যাদি।

সুকুমার সেনের এ-আলোচনায় সিম্বল বা প্রতীকধর্মিতার তাত্ত্বিক দিকটিও প্রকটিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গানে-কবিতায় শব্দ, ভাব কর্ম নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়ে সিম্বল বা প্রতীক হয়ে উঠেছে। প্রমাণের জন্যে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গানের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন প্রাবন্ধিক সুকুমার সেন। শুধু তাই নয়, গানে ছন্দ, যতি, তাল ও সুরের সঙ্গো নাচের ভঙ্গিও কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা দৃষ্টান্ত তুলে ধরে দেখিয়েছেন। সবশেষে রবীন্দ্রনাথের গীতিশিল্পে পদাবলি কীর্তনের গানের ঠাটের প্রভাব কীভাবে অনুরঞ্জিত করেছে তা আলোচনা করেছেন। প্রাচীন পাঁচালি গানে ধুয়া পদের মতো কিছু গান রবীন্দ্রনাথের গানে পরিলক্ষিত হয়েছে — "তোমায় চেয়ে আছি বসে পথের ধারে সুন্দর হে/ জমল ধুলা প্রাণের বীণার তারে তারে সুন্দর হে... "; "লহো লহো তুলে লহো নীরব বীণাখানি/ তোমার নন্দন নিকুঞ্জ হতে সুর দেহো তায় আনি/ ওহে সুন্দর হে সুন্দর"; "কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে/ সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।/ ভুলে গেছি কবে থেকে আসছি তোমায় চেয়ে—/ সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়"; "তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি,/ ওই যে আসে, আসে, আসে।/ যুগে যুগে পলে পলে দিন-রজনী/ সে যে আসে, আসে, আসে।।/ গেয়েছি গান যখন যত আপন মনে খ্যাপার মতো/সকল সুরে বেজেছে তার আগমনী — / সে যে আসে, আসে, আসে।... " ইত্যাদি।

সপ্তদশ শতকে পদাবলি কীর্তন গানের মধ্যে মূল গায়ক কর্তৃক যে আঁখর সংযোজন রীতি তা রবীন্দ্রনাথের গানের অন্যতম একটি বিশেষত্ব। ড. সুকুমার সেন বলেছেন — "এই আঁখর সংযোজন রীতিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের পরিধেয় অলংকার রূপে না রেখে নাকছাবির মতো দেহসন্নিবিষ্ট অলঙ্কাররূপে অর্থাৎ গানের অংশরূপে গ্রহণ করেছিলেন। এই আঁখর গ্রহণ রবীন্দ্রগীতির ও রবীন্দ্রগীতের একটি বড় বিশেষত্ব।"[৯] আঁখরে গড়া রবীন্দ্রগানের বহু উদাহরণ ড. সেন দিয়েছেন। যেমন একটি হলো —

"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না।
কেন মেঘ আসে হৃদয়-আকাশে, তোমারে

দেখিতে দেয় না।
(মোহ মেঘে তোমারে দেখিতে দেয় না।
অন্ধ করে রাখে, তোমারে দেখিতে দেয় না।)
ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে তোমায় যবে
পাই দেখিতে
ওহে 'হারাই হারাই' সদা হয় ভয়, হারাইয়া
ফেলি চকিতে।
(আশ না মিটেতে হারাইয়া-পলক না —
পড়িতে হারাইয়া —
হৃদয় না জুড়াতে হারাইয়া ফেলি চকিতে।)"[১০] ইত্যাদি।

অষ্টাদশ শতকে পদাবলি কীর্তন গানের 'তুক্ক' বা 'তুক' রীতি ঠাটে রবীন্দ্রনাথের গানের অজস্র দৃষ্টান্ত মেলে। আচার্য সেন কর্তৃক উল্লেখ্য কিছু উদাহরণ — "আমি ফিরব না রে, ফিরব না আর, ফিরব না রে—/ এমন হাওয়ার মুখে ভাসল তরী—/ কূলে ভিড়ব না আর, ভিড়ব না রে"; "যাত্রী আমি ওরে,/ পারবে না কেউ আমায় রাখতে ধরে"; "যেতে যেতে চায় না যেতে, ফিরে ফিরে চায়—/ সবাই মিলে পথে চলা হল আমার দায় গো"; "ও দেখা দিয়ে যে চলে গেল ও চুপিচুপি কী বলে গেল/ যেতে যেতে গো, কাননেতে গো ও কত যে ফুল দ'লে গেল"; "এ কী গভীর বাণী এল ঘন মেঘের আড়াল ধ'রে/ সকল আকাশ আকুল ক'রে"; "আমার জ্বলেনি আলো অন্ধকারে/ দাও না সাড়া কি তাই বারে বারে"; "কোন্ সে ঝড়ের ভুল/ ঝরিয়ে দিল ফুল,/ প্রথম যেমনি তরুণ মাধুরী মেলেছিল এ মুকুল/ হায় রে"; "গগনে গগনে ধায় হাঁকি/ বিদ্যুৎ বাণী বজ্রবাহিনী বৈশাখী" ইত্যাদি।

আচার্য সুকুমার সেনের এই দীর্ঘ বিশ্লেষণ প্রমাণ করেছে রবীন্দ্রনাথের গীতিশিল্প প্রাগাধুনিক বৈষ্ণব ভাবনা ও প্রেমচেতনার দ্বারা প্রভাবিত ও আচ্ছাদিত ছিল। তবে তার চূড়ান্ত রূপ সম্পূর্ণ আধুনিক এবং স্বতন্ত্র। এই বিশ্লেষণে শুধু রবীন্দ্রনাথকে নতুনভাবে আবিষ্কার নয়, আচার্য সুকুমার সেনের রবীন্দ্রশিল্পের প্রতি গভীর অনুরাগের পরিচয় তুলে ধরে। আচার্য সুকুমার সেন রবীন্দ্রনাথের গান সাধনার মধ্যেই শুধু সীমাবন্ধ ছিলেন; রবীন্দ্রগানে সুর ও তালের সঙ্গে নাচের সংযোগসূত্র স্থাপন করেছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের নৃত্য ভাবনা বিষয়ে লিখেছেন 'নৃত্যগীত ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক নিবন্ধটি। এটি ১৯৮১ সালের ১৫ এপ্রিল রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠিত সুচিত্রা মিত্র ও সংযুক্তা পানিগ্রাহীর অনুষ্ঠানের সুভেনিয়ারে প্রকাশিত। এ-প্রবন্ধের ভূমিকায় কাব্য-সংগীত-নৃত্যের তুলনা প্রসঙ্গে সুকুমার সেন বলেছেন — "গানে তাল যেমন নাচের ভঙ্গির সিম্বল কবিতায় তেমনি যতি নাচের সংক্ষিপ্ত সিম্বল — ঠেকা।"[১১] আদিতে কবিতা-গান-নৃত্য অবিচ্ছিন্ন থাকলেও ক্রমশ তারা নিজস্ব পথে অগ্রসর হতে থাকে। গানের সঙ্গে জড়িত নাচ বিচ্ছিন্ন হয়ে 'শুধু দৃশ্যমূর্তিতে অর্থাৎ অঙ্গ চেষ্টায় একটি স্বতন্ত্র পথ নিয়েছিল।' এর কারণ হিসেবে সুকুমার সেন সেকালের নাট্যাভিনয় রীতিকেই দায়ি করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে 'পুতুল নাচ' ও কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটকে 'চর্চরী' ও 'জম্ভলিকা' নাচের কথা বলেছেন সুকুমার সেন। তাঁর বিশ্লেষণে — ''চর্চরী' হল 'চাঁচর' অর্থাৎ দোলে যেমন হয় তেমনি উদ্দাম ধরণের নৃত্য।' আর 'জম্ভলিকা' হলো ''ঝুমুর' অর্থাৎ স্ত্রী শোভন মধুর নাচ।' রবীন্দ্রনাথের নৃত্য ও গানের আলোচনায় সুকুমার সেন নৃত্যবিমুক্ত গান জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' ও গীত বিমুক্ত নৃত্য হিসেবে 'আরতি' অনুষ্ঠানের কথা বলেছেন।

ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে গানের সঙ্গে নাচের পুনঃসংযোগ ঘটতে দেখা যায় যার সংগঠক হিসেবে সুকুমার সেন শ্রীচৈতন্যের কথা তুলে ধরেছেন। বৈষ্ণব নামযজ্ঞে 'ধুলোট'এর পাশাপাশি প্রফেশনাল মেয়েদের 'ঝুমুর' নাচ ও দেশি মেয়েলি 'খেমটা' নাচ এবং নাচ-গানের সম্মিলিত দৃষ্টান্ত হিসেবে 'ঢপকীর্তন' ও বাউল বৈষ্ণবদের দেহতত্ত্ব ঘটিত সহজিয়া গানের ভেলায় ভেসেছেন সুকুমার সেন। নাচ-গানের যুগল মিলনের অন্যতম কারিগর রবীন্দ্রনাথের অবদানের কথা তুলে ধরে সুকুমার সেন বলেছেন — "সুরের দোলায় চড়িয়ে এদিক ওদিক ঠেলা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তালকে নাচের ঢেউয়ে তরঙ্গিত অথবা উত্তাল করে দিয়েছেন।"[১২] রবীন্দ্রনাথের গানে সুর ও তাল কীভাবে নির্দিষ্ট দেহভঙ্গি নির্দেশ করে, তার কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন সুকুমার সেন। যেমন —

১. “যাত্রী আমি পড়ে যাত্রী আমি...” — দৌড় ঝাঁপ ও চলার ভঙ্গি
২. “চলি গো চলি গো যাই গো চলে... ” — চলন্ত ট্রেনের চাকা ও লাইনের দ্রুত তালের তান। একে সুকুমার সেন বলেছেন ‘তুর্কি ঘোড়ার নাচ’।
৩. “কূল থেকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে সাগর মাঝে” — ধীর, স্থির নিশ্চয়ের নির্ভীক প্রশান্তির গমন।
৪. “পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে... ” — উদ্দাম নাচ। সুকুমার সেনের কথায় ‘উদ্দাশ্য বেপরোয়া মাতালে কাণ্ড’।
৫. “খরবায়ু বয় বেগে... ” — আশঙ্কা ও দৃঢ় চিত্তমনের একটানা অধ্যাবসায়ের তান।
৬. ‘দিনের বেলায় বাঁশি তোমার বাজিয়েছিলে অনেক সুরে” — ক্লান্তি পায়ে টেনে টেনে চলা।
৭. “এলেম নতুন দেশে... ” — ধীরমন্দ স্রোতে কূলে ওঠার নৃত্যছন্দ।

নাচের সঙ্গে তাল নেই এমন দৃষ্টান্তও উল্লেখ্য — “আমি তখন ছিলেম মগন গহন ঘুমের ঘোরে”; “অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দোবন্ধনে” ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের নৃত্য ও গানের এ-বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুধু অভিনবত্ব ও মৌলিকতাকে নয়, আচার্য সুকুমার সেন হয়ে উঠেছেন একজন শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্র-সংগীত বিশেষজ্ঞ।

তথ্যসূত্র:

১। ‘দিনের পরে দিন যে গেল’, সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম অখণ্ড সংস্করণ জানুআরি ২০০১, পৃ. ১৭১
২। ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’ (চতুর্থ খণ্ড), সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ ১৩৮৮, পৃ. ৪২৯
৩। ‘প্রবন্ধ সংকলন’ ২, সুভদ্রকুমার সেন, ও সুনন্দনকুমার সেন সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ জানুআরি ২০১৬, পৃ. ১৮৯
৪। ওই, পৃ. ১৯০
৫। ওই, পৃ. ২০৫
৬। ওই, পৃ. ২০৬
৭। ওই, পৃ. ২২৫
৮। ওই, পৃ. ২৫১
৯। ‘প্রবন্ধ সংকলন’ ৫, সুভদ্রকুমার সেন, ও সুনন্দনকুমার সেন সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ২০২৪, পৃ. ৪৮৪
১০। ওই, পৃ. ৫০৫
১১। ‘প্রবন্ধ সংকলন’ ২, সুভদ্রকুমার সেন, ও সুনন্দনকুমার সেন সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ জানুআরি ২০১৬, পৃ. ১৯০ পৃ. ২২৬
১২। ওই, পৃ. ২২৯

—

© Santiniketan Sahityapath